Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.81-87
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ এবং দুঃখ নিরোধ মার্গ: একটি সমীক্ষা

রনজয় খাঁ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বড়জোড়া কলেজ, বড়জোড়া, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Sadness is one of the most intense and painful emotions in human life. Life is basically a collection of many sorrows. Therefore, since birth, humans have been searching for happiness by conquering sorrow. According to the doctrine that the beginning and the end of human life is full of suffering, that doctrine is called dukhabad. Almost all Indian philosophies, except Cārvakā, have discussed about suffering, but they have not only discussed about suffering, but also about how people can get rid of it. I will discuss in my research article about suffering in Buddhist philosophy and how it is possible to get rid of suffering.
Key words: Suffering, Avidyā, Tṛṣṇā, Revirth, Nirvāṇa.

ভূমিকা: ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ছাড়া প্রায় সকল দর্শনসম্প্রদায়েই দুঃখ এবং দুঃখ নিবৃত্তির আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। সেগুলির মধ্যে বৌদ্ধ দর্শন অন্যতম। বুদ্ধদেব বলেছেন “সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্”। অর্থাৎ সব কিছুই দুঃখময়। ন্যায়-বৈশেষিক, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত ও জৈন দর্শনে জীবদ্দশাকে দুঃখময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদেও ব্রহ্ম ছাড়া সমস্ত কিছুই দুঃখময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গীতাতেও জীবের দুঃখের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে দুঃখের কথা বলা হলেও দুঃখই শেষ কথা নয়। ভারতীয় দর্শনে বলা হয়, জগতে দুঃখ যেমন আছে তেমনি দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি আছে এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও রয়েছে। এই প্রবন্ধে বৌদ্ধ দর্শনের আলোকে দুঃখ ও দুঃখ নিরোধ মার্গ আলোচিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব চারটি আর্যসত্যের কথা বলেছেন। এই চারটি আর্যসত্য হল (ক) দুঃখ, (খ) দুঃখ সমুদয়, (গ) দুঃখ নিরোধ, এবং (ঘ) দুঃখ নিরোধ মার্গ। এই চারটি আর্যসত্যকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের চারটি নিদানের সঙ্গে তুলনা করে ব্যাখা করার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। যথা- রোগ, রোগের কারণ, রোগের উপশম, রোগ উপশমের উপায়। দৈনন্দিন জীবনে দুঃখ হল রোগ তুল্য, দুঃখের কারণ হল রোগের কারণ সদৃশ, দুঃখ নিরোধ হল রোগ উপশমতুল্য আর দুঃখ নিরোধ মার্গ হল রোগ উপশমের উপায় সদৃশ।[1]

প্রথম আর্যসত্য হল দুঃখ। বুদ্ধদেব দুঃখকে প্রথম আর্যসত্য বলে মনে করায় অনেকে মনে করেন দুঃখই বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথা। কিন্তু একথা সত্য নয়। দুঃখ দিয়ে বৌদ্ধ দর্শন শুরু হলেও সেটির মধ্যে দিয়েই

[1] ভারতীয় দর্শন, দেবব্রত সেন, পৃষ্ঠা ৬৮।

তিনি মানব সমাজকে আশাবাদী এবং ব্যাবহারিক হতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কোন ব্যক্তি রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েও যদি সে বলে – সে দুঃখী নয়, তাহলে বলা যেতে পারে সে মিথ্যা কথা বলছে। যদি কখনও কোন সমস্যার উৎপত্তি হয় তাহলে প্রয়োজন সেই সমস্যার সমাধান করা, কখনই সেটিকে উপেক্ষা করা নয়। বুদ্ধদেব যদি শুধুমাত্র দুঃখের প্রসঙ্গ আলোচনা করে থেমে যেতেন, তাহলে তখন বলা যেত বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু বুদ্ধদেব প্রথম আর্যসত্য দুঃখের কথা বলার পর তিনি দুঃখের কারণ নির্দেশ করেছেন, দুঃখ নিবৃত্তির কথা বলেছেন এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ের কথা বলেছেন। বুদ্ধদেব নিজের জীবন এবং শিষ্যদের জীবনের মাধ্যমে তিনি একটি বিষয় পরিস্কার করতে চেয়েছেন যে, সংসারের দুঃখের স্বরূপকে জেনে মানুষ যদি সেই দুঃখ থেকে পরিত্রানের চেষ্টা করে তাহলে সে একদিন না একদিন গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবে (জয় লাভ করবে) এবং দুঃখ মুক্তিরূপ পরম শান্তি লাভ করবে। বুদ্ধদেবের মতে পরম শান্তিই হল নির্বাণ।[2]

এই জগতে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ রয়েছে, সেই সমস্ত দুঃখ গুলিকে বুদ্ধদেব আটটি পর্যায়ভুক্ত করেছেন।[3] যথা – জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, ঈস্পিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ, এবং পঞ্চোপাদান স্কন্ধময় এই দেহ ও মন দুঃখে পরিপূর্ণ। বুদ্ধদেব ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন’ সূত্রে এই আট প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন। কিন্তু অভিধর্ম পিটকে ব্যাধি দুঃখের পরিবর্তে ‘সোক-পরিদেব-দুঃখ-দোমনসস-উপায়াসা দুঃখের কথা বলা হয়েছে। মাতৃগর্ভ থেকে ভ্রুণের উৎপত্তি হওয়ার সময় থেকে আরম্ভ করে দশ-মাস পর্যন্ত মাতৃকুক্ষির জঠরে সর্বদা জ্বলমান অগ্নির সন্তাপে সন্তপ্ত (অগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে) হয়ে ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র দুঃখ আর দুঃখ। জন্ম গ্রহণের পর থেকেই শুরু হয় অনন্ত দুঃখ, বিভিন্ন প্রকার দুঃখ এবং আমৃত্যু এই দুঃখ চলতে থাকে। এই দুঃখ থেকে মানুষের রেহায় নেই। জন্ম-জন্মান্তর ধরে জীব এই সকল দুঃখ ভোগ করে আসছে। বলা যায়, এই দুঃখ সর্বজনীন। এই দুঃখ থেকে কারো রেহায় নেই। উপরিউক্ত আট প্রকার দুঃখ জীব সমূহকে কোন না কোন ভাবে ভোগ করতেই হয়।

জন্ম দুঃখ: একটি সত্ত্বের বা জীবের মাতৃকুক্ষিতে কললাকারে উৎপন্ন হয়ে মাতৃকুক্ষি থেকে বাহির হয়ে ভূমিষ্ট হওয়াই হল জন্ম। আমরা কখনও চিন্তা করতে পারি না যে, মাতৃগর্ভ সব সময় জ্বলমান উত্তপ্ত বদ্ধ কটাহ অর্থাৎ যার মধ্যে কোন জানালা বা দরজা নেই, আলো নেই, বাতাস নেই, বায়ু প্রবেশের কোন রাস্তা নেই। এই অবস্থায় মানব জীবন এক নিদারুন দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করে থাকে। জন্ম গ্রহণের পরমুহূতেই আমাদের রোদন শুরু হয়। এই রোদন মানব জীবনের একটি সংকেত স্বরূপ। মানব শিশুর যদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর না কাঁদে তাহলে সেই শিশুকে আবার অশুভ বলা হয়। অর্থাৎ জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে। তাই ডাক্তার বা সেবিকা শিশুটিকে কৃত্রিম ভাবে কাঁদানোর চেষ্টা করে। ভাবটা এমনই যে, “তুমি দুঃখ ভোগের জন্য জন্ম গ্রহণ করেছ। সারা জীবন ধরে তোমাকে কত না রোদন বা কান্না, শোক, বিলাপ করতে হবে। কত না অশ্রু বিসর্জন দিতে হবে – একথা ধ্রুব সত্য। অতএব, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তোমাকে রোদন করতে হবে”।[4]

ব্যাধি দুঃখ: দেহ বা শরীর উৎপন্ন হলে তাকে ব্যাধির স্বীকার হতে হয়। ব্যাধি বিভিন্ন প্রকারের। শৈশব থেকে শুরু করে আমরা বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি ভোগ করা থাকি। মানব জীবনের ব্যাধি বিভিন্ন ধরণের তবে ব্যাধি মুক্ত

[2] গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ডঃ সুকোমল চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৫।
[3] গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন ডঃ সুকোমল চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৮।
[4] গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন ডঃ সুকোমল চৌধুরী পৃষ্ঠা ২৯।

জীবন যে নেই একথা অবশ্য স্বীকার্য। কেউ শৈশবে, কেউ যৌবনে, কেউ আবার বার্ধেক্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। কিছু কিছু ব্যাধি এমন মারাত্মক হয় যা প্রাণ সংশয়ও ঘটাতে পারে। সাধারণ মানুষ ছাড়াও যারা মহাপুরুষ তারাও ব্যাধি মুক্ত ছিলেন না। বুদ্ধদেব নিজেও অনেক বার বিভিন্ন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং শেষে তাঁর রক্তামাশাতে মৃত্যু হয়েছিল।

জরা দুঃখ: জরা হচ্ছে জীর্ণতা, বয়স যখন বাড়ে তখন শরীরের মধ্যে ভাঙন ধরে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীথিল হয়। জরাগ্রস্থ ব্যক্তির শরীরের শিরা, উপশিরা ভেসে ওঠে, দেহের চামরা শিথিল এবং শুস্ক হয়ে যায়। জীবনের আয়ু কমে যায়, ইন্দ্রিয় সমূহের ক্ষমতা কমে আসে। জন্ম গ্রহণের পর মৃত্যু যেমন অবশ্য স্বীকার্য তেমনি জরাও অবশ্য স্বীকার্য। তবে কর্ম বশত যার আয়ু কম তাকে জরাগ্রস্থ হতে হয় না। কারণ, জরা আসিবার আগেই তার মৃত্যু হয়। তাই জরাকে ভয়ঙ্কর এবং দুঃখদায়ক বলা হয়। জরা মনুষ্য জীবনের রমনীয় কোমল ক্লান্তি ধ্বংস করে, জরা রূপ যৌবন ধ্বংস করে, জরা মানুষকে ক্রমশ মৃত্যু পথে ঠেলে দেয়। জরা গ্রস্ত ব্যক্তি সব সময় অসহায়। জরাগ্রস্থ হলে নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ নিজের কাছে উপস্থিত হলে জরা গ্রস্ত ব্যক্তি তা ভোগ করতে পারে না; কারণ ভোগের শক্তি ব্যক্তির আর থাকে না।

মৃত্যু দুঃখ: মৃত্যু হল পঞ্চস্কন্ধের ভেদ, কলেবরের নিক্ষেপ, জীবিত ইন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ অর্থাৎ প্রাণ বায়ু পরিত্যাগ হওয়া। মৃত্যু সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জন্মগ্রহণ করলেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। মৃত্যু থেকে মনুষ্য জীবনের পরিত্রাণ নেই। তাই মৃত্যু দুঃখজনক।

অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ: জগতের যা কিছু অপ্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি সেগুলির সঙ্গে সংযোগ হলেই মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। অপ্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি কি তা বর্ণনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলেছেন যে, যে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ অপ্রিয় এবং অনর্থকামী, অহিতকামী সেগুলির সঙ্গে যে সংযোগ বা মিলন তা দুঃখদায়ক এবং মানসিক ভাবেও পীড়াদায়ক। এইরকম অভিজ্ঞতা প্রত্যেক মানুষেরই হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি মানুষেরই জীবন ব্যাপী কোন না কোন অপ্রিয় সংযোগ হয়ে থাকে, আর সেই জন্যই তাকে দুঃখ পেতে হয়।

প্রিয় বিয়োগ দুঃখ: জগতের যা কিছু প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি, সেগুলি থেকে বিচ্ছেদ হলেই মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। বুদ্ধদেব প্রিয় বিয়োগ দুঃখ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ প্রিয়জনক এবং যা মঙ্গলজনক, উপকারী, সুখকামী তার থেকে যে বিয়োগ তা দুঃখদায়ক এবং মানসিকভাবে পীড়াদায়ক। এই প্রকার অভিজ্ঞতা প্রত্যেক মানুষেরই হয়। প্রত্যেকটি মানুষেরই জীবনব্যাপী কোন না কোন প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় এবং সেই জন্য মানসিকভাবে দুঃখ পেতে হয় যার কোনো পরিসীমা নেই।

ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ: মানুষ সব সময় যা চায় তা পায় না, আবার যা যা কামনা করে সেটিও যে সব সময় পায় তাও নয়। সুতরাং, না পাওয়ার জন্য মানুষ দুঃখ পায়। জীবন ব্যাপী এই না পাওয়া বা অপ্রাপ্তিই হল দুঃখ। তবে বুদ্ধদেব এইসব না পাওয়ার থেকে আরো গভীরে চিন্তা করেছেন। তিনি বলেছেন, জন্মাধীন সত্ত্বগণ এইরূপ চিন্তা করেন – 'আমরা জন্মাধীন হব না, আমাদের যেন আর জন্ম না হয়'। কিন্তু তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। এটি ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ। ঠিক সেই রূপ তাঁরা চিন্তা করেন – 'আমরা জরাধীন হব না,

ব্যাধির অধীন হব না, মৃত্যুর অধীন হব না, শোক পরিদেব, দুঃখ দৌর্মনস্য হতাশার অধীন হব না"।[5] কিন্তু তাদের সেই অপ্রাপ্তি পূরণ হয় না। এটি ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ।

পঞ্চোপাদান স্কন্ধ দুঃখ: রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদান হল পঞ্চস্কন্ধ। এই পঞ্চস্কন্ধ নিয়েই মানব শরীর গঠিত হয় এবং তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে বলেই এই মানব শরীর বিপরীণামধর্মী অর্থাৎ প্রত্যেক মুহূর্তে পরিবর্তনশীল সুতরাং অনিত্য। এই রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ যখন তৃষ্ণার বিষয় হয়ে ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাকে উপাদান স্কন্ধ বলা হয়। এই পঞ্চস্কন্ধের অর্থাৎ জড় ও চেতনের একত্র অবস্থানকেই বলা হয় জীবন প্রবাহ। এটিই সত্ত্ব, জীব ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

বুদ্ধদেব দ্বিতীয় আর্যসত্যে দুঃখের কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব দুঃখের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বারোটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বারোটি কারণ হল - অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি এবং দুঃখ। দুঃখ হল জড়া, মরণ, ব্যাধি ইত্যাদি। এই জরা-মরণাদির কারণ হল জন্ম বা জাতি। মানুষ জন্ম গ্রহণ করে বলেই দুঃখ ভোগ করে। জন্মগ্রহণ না করলে দুঃখ ভোগ করতে হত না। এই জন্ম বা জাতি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। জন্মেরও কারণ রয়েছে। জন্মের কারণ হল জন্মানোর ইচ্ছা বা ভব। মানুষের মধ্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করার যে প্রবল প্রবণতা বা ব্যাকুলতা তাই হল ভব। জন্মের এই প্রবণতা বা ব্যাকুলতা থেকেই আমাদের জন্ম হয়। জন্মের এই ব্যাকুলতা থেকে আসে জাগতিক বস্তু বা বিষয় ভোগের প্রতি আসক্তি থেকে। জাগতিক বস্তু বা বিষয়ের প্রতি এই আসক্তিকে বলা হয় উপাদান। উপাদানের কারণ হল তৃষ্ণা। ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করার আকাঙ্খাই হল তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণাই হল দুঃখের অন্যতম প্রধান কারণ। তৃষ্ণার কারণ হল বেদনা। এই বেদনায় বস্তু সম্ভোগের প্রতি তৃষ্ণার সৃষ্টি করে। স্পর্শ বেদনার কারণ। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগই হল স্পর্শ। এই সংযোগের কারণ হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক এবং জিহ্বা ছয়টি ইন্দ্রিয়। এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে বলা হয় ষড়ায়তন। জগতের সকল বস্তুর অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আমাদের দেহ-মন এই ষড়ায়তনের কারণ। প্রত্যেকটি জীব এই দেহ-মনের সমন্বিত এক সত্ত্বা। এই সত্ত্বাকে বলা হয় নামরূপ। এই নামরূপের কারণ হল বিজ্ঞান। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে যে প্রাথমিক চেতনা ভ্রূণের আকার ধারণ করে তাকেই বলা হয় বিজ্ঞান। দেহ-মনের উদ্ভবই হত না, বিজ্ঞান না থাকলে। পূর্ব জন্মের সংস্কার থেকে সৃষ্টি হয় বিজ্ঞানের। কাজেই সংস্কার হল বিজ্ঞানের কারণ। সংস্কারের কারণ হল অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান। এই অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান হল সকল প্রকার দুঃখের মূল কারণ।

উপরিউক্ত কারণ শৃঙ্খল থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কার্যের দিক থেকে যেমন দুঃখ শেষ উৎপন্ন কার্য, তেমনি কারণের দিক থেকে অবিদ্যা প্রথম কারণ। এই কারণ শৃঙ্খল দাঁড়িয়ে আছে প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ নীতির উপর। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অনুসারে কারণকে অনুসরণ করেই কার্য উৎপন্ন হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ শাশ্বতবাদ এবং উচ্ছেদবাদের মধ্যবর্তী পথ। শাশ্বতবাদ অনুযায়ী বস্তু অনাদি ও অনন্ত কাল ধরে স্থায়ী। বিপরীতভাবে উচ্ছেদবাদ অনুযায়ী বস্তুর উচ্ছেদ ও বিনাশই চরম সত্য। কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদ নিয়ম অনুযায়ী কোন ধর্মই যেমন শাশ্বত নয়, তেমনি ধর্মের আত্যন্তিক উচ্ছেদও একান্ত ভাবে সত্য নয়। আবার প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ যদৃচ্ছাবাদ, নিয়তিবাদ ও স্বভাববাদের বিরোধী। এই প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ নীতির সাহায্যেই বুদ্ধদেব যাবতীয় জাগতিক কারণ নির্দেশ করেছেন।

---

[5] গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ডঃ সুকোমল চৌধুরী পৃষ্ঠা ৩৫।

বুদ্ধদেব তৃতীয় আর্যসত্যে দুঃখ নিরোধের কথা বলেছেন। দুঃখ যদি উৎপন্ন বা কার্য বস্তু হয় তাহলে, সেটির নিরোধ বা ধ্বংসও সম্ভব। দুঃখের নিরোধই হল 'নির্বাণ'। 'নির্বাণ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'নিভে যাওয়া'। একটি তৃণ খণ্ড পুড়ে শেষ হয়ে গেলে আগুন যেমন নিভে যায় তেমনি জীব কামনা-বাসনার চিরবিলুপ্তিতে নির্বাণ লাভ করে। এই নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যেই বুদ্ধদেব চতুর্থ আর্যসত্যে দুঃখ নিরোধমার্গে আটটি মার্গের উল্লেখ করেছেন। এই আটটি মার্গকে অষ্টাঙ্গিকমার্গ বলা হয়।

বুদ্ধদেব নির্দেশিত চতুর্থ আর্যসত্যটি হল দুঃখ নিরোধ মার্গ বা দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। অবিদ্যা দুঃখের মূল কারণ একথা চার্বাক ছাড়া প্রায় সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় স্বীকার করেন। কিন্তু এই অবিদ্যাকে কিভাবে বিনাশ করা যায় সে ব্যাপারে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দেশ করেছেন। বুদ্ধদেব দুঃখ নিরোধ মার্গ বা দুঃখ নিবৃত্তির উপায়কে নির্বাণ লাভের একমাত্র অবলম্বন বলে বর্ণনা করেন নি। শুধু তাই নয়, এই মার্গের সাহায্যে তিনি ব্যবহারিক দিক এবং সূক্ষ্ম জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করেছেন। প্রাত্যহিক জীবন যাত্রাকে অবহেলা না করে সাধারণ মানুষ কিভাবে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে ধীরে ধীরে নির্বাণের পথে এগিয়ে যেতে পারে বুদ্ধদেব চতুর্থ আর্যসত্য তার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা নির্দেশ করেছেন। এই দুঃখ নিরোধমার্গ বা দুঃখনিবৃত্তির উপায় আটটি অঙ্গ বিশিষ্ট। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলি হল - সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সমাধি।

সম্যক্ দৃষ্টি: অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজিনত আত্মা এবং জগত সম্বন্ধে মিথ্যা দৃষ্টিই হল দুঃখের মূল কারণ। সম্যক্ দৃষ্টির সাহায্যেই মিথ্যা দৃষ্টি দূর করতে হবে। সেইজন্য নির্বাণ লাভের জন্য নির্বাণার্থীর প্রথমেই প্রয়োজন সম্যক্ দৃষ্টি। বৌদ্ধ মতে কর্ম, জ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। চারটি আর্যসত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় সম্যক্ দৃষ্টি।

সম্যক্ সংকল্প : সম্যক্ দৃষ্টি থেকেই উৎপন্ন হয় সম্যক্ সংকল্প। জাগতিক বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য, বিশ্বপ্রেম এবং যথার্থ মানবতার সংকল্পই হল সম্যক্ সংকল্প। সম্যক্ দৃষ্টি অনুযায়ী সকলের প্রতি ভালোবাসা, কোনো ব্যক্তির প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ না করা, ক্ষতি না করা প্রভৃতি থেকে দূরে থাকার সংকল্প করতে হবে। তা না হলে নির্বাণার্থীর পক্ষে সম্যক্ দৃষ্টি বৃথা হয়ে পড়বে।

সম্যক্ বাক্: সম্যক সংকল্পকে ব্যবহারিক কর্মে পরিণত করতে হলে সম্যক বাক্ প্রয়োজন। সংযত বাক্ অর্থাৎ সংযত কথনই বিভিন্ন কর্মের প্রথম এবং অন্যতম মাধ্যম। মিথ্যাকথা, কটূকথা, পরনিন্দা, অপরের প্রতি কর্কশবাক্য প্রভৃতি বিরত থাকায় হল সম্যক্ বাক্।

সম্যক্ কর্মান্ত: সম্যক সংকল্প যেমন নির্বাণার্থীর বাক্য নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি তার দ্বারা কর্ম নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। নির্বাণার্থী ব্যক্তির কর্মেও সংকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। 'শীল' এবং 'দান'কে বুদ্ধদেব সম্যক্ কর্মান্তের অন্তর্গত করেছেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে একত্রে বলা হয় শীল। আর দারিদ্রের জন্য আত্মত্যাগই হল দান।

সম্যক্ আজী: প্রতারণা না করে বা অসৎ উপায় অবলম্বন না করে জীবিকা অর্জন করাই হল সম্যক্ আজীব।[6]

[6] ভারতীয় দর্শন, দেবব্রত সেন, পৃষ্ঠা ৭০।

সম্যক্ ব্যায়াম: সম্যক্ ব্যায়াম অর্থ হল প্রচেষ্টা বা শ্রম বা অনুশীলন। শারীরিক ব্যায়ামের দ্বারা যেমন দেহ বা শরীর সুস্থ থাকে, তেমনি মানসিক ব্যায়ামের দ্বারা মন বা চিন্তা সুস্থ থাকে। চঞ্চল চিত্তকে সংযত করার জন্য প্রয়োজন জাগ্রত অসৎ চিন্তাকে মনকে থেকে দূর করা, নতুন অসৎ চিন্তার উদয় না হওয়া, চিত্তকে সৎ চিন্তা এবং কুশল ভাবের উদয় ঘটানো এবং জাগ্রত সৎ চিন্তা এবং কুশল ভাবকে মনে লালন পালন করা এবং পোষণ করা। তাই নির্বাণ লাভের জন্য মনের ব্যায়াম প্রয়োজন।

সম্যক্ স্মৃতি: প্রত্যেকটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপের স্মরণই হল সাম্যক্ স্মৃতি। নির্বাণার্থীকে সব সময় স্মরণ করতে হবে যে, এই জগতে কোন কিছুই নিত্য নয়। যদি এই স্মৃতি সব সময় স্মরণ থাকে তাহলে জাগতিক কোন বস্তুর প্রতি আর আসক্তি থাকে না।

সম্যক্ সমাধি: বুদ্ধদেবের নির্দেশিত দুঃখ নিরোধ মার্গের শেষ স্তরটি হল সম্যক্ সমাধি। সমাধির চারটি স্তর যথা – প্রথম স্তরে নির্বাণ এক সুখকর ও আনন্দময় অবস্থায় অবস্থান করে। দ্বিতীয় স্তরে নির্বানার্থীর মন বিচার বিতর্ককে অতিক্রম করে চারটি আর্যসত্যে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। তবে এই অবস্থাতেও সাধকের মনে আনন্দ ও শান্তির বোধ থাকে। তৃতীয় স্তরে নির্বাণার্থী এই আনন্দের বোধকে অতিক্রম করে যায়। এর ফলে তার মধ্যে বাহ্যিক বিষয়বস্তুর প্রতি এক উপেক্ষার ভাব এবং দৈহিক স্বস্তিভাব জাগ্রত হয়। চতুর্থ স্তরে সমাধি গভীরতর হয় এবং সমস্ত প্রকার অনুভূতির বিলোপ ঘটে এবং নিবার্ণার্থী একপ্রকার নির্লিপ্ত ও উদাসীন অবস্থা প্রাপ্ত হন।

বৌদ্ধ দর্শন বেদ-বিরোধীতার কারণে নাস্তিক হলেও সমস্ত প্রকার জাগতিক দুঃখ কষ্ট থেকে মানুষের মুক্তি লাভের কথা ঘোষনা করে। বৌদ্ধ দর্শনে মানুষের মুক্তি লাভের আলোচনার ক্ষেত্রেই নির্বাণের বিষয়টি স্থান পেয়েছে। কারণ, জীবনকে সমস্ত প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই সদাচার মূলক আচরণের উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথাই হল মানুষের আচরণকে সদাচার শিষ্টাচারে পরিণত করে নির্বাণের পথে পরিচালিত করা। দুঃখ নিরোধ মার্গের বিভিন্ন স্তরে নির্বাণ লাভের জন্য যে উপদেশ নির্দিষ্ট হয়েছে তা বস্তুত প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধির উপদেশ। সাধারণ মানুষের কাছে নির্বাণ দূর্লভ হলেও সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম এবং সম্যক্ আজীব এই তিনটি অঙ্গ বা বিধি অনুসরণ করে তাঁরা তাদের জীবনকে শুদ্ধ ও পরিশীলিত করে তুলতে পারে। এই দর্শনে সাধারণ মানুষের প্রতি যে ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা সঙ্গত হবে যে, এই দর্শনে একদিকে যেমন মানবিকতা ও জনকল্যাণের আদর্শ প্রচারিত হয়েছে ঠিক সেই রকমই অপরদিকে ন্যায়সম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে একটি নৈতিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে। সব শেষে বলা যায় যে, যতদিন এ জগতের বুকে বৌদ্ধ দর্শন আলোচিত হবে ততদিন জায়গা করে নেবে মননশীল মানুষের সূক্ষ্ম মানসিকতায়।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ (২০১৮), ন্যায় দর্শন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
2. ভাবঘনানন্দ, স্বামী, (২০০০), সাংখ্যকারিকা, কলকাতা উদ্বোধন কার্যালয়: কার্যালয়।
3. ভর্গানন্দ, স্বামী, (২০০৪), সাংখ্যকারিকা, কলকাতা উদ্বোধন কার্যালয়: কার্যালয়।
4. বিদ্যারণ্য, স্বামী, (১৯৯৯), বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
5. চৌধিরী, সুকোমল, (২০২১), গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।
6. শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র (২০০৬), ষড়্‌দর্শন: যোগ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
7. মণ্ডল, কুমার, প্রদ্যোত, (২০২১), ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলির্শাস।
8. সেন, দেবব্রত, (২০০১), ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।